তৃতীয় অধ্যায়

বরাক উপত্যকার কথাসাহিত্যের প্রেক্ষিতে শেখর দাশের অবস্থান

বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্যের আবির্ভাব লগ্ন ষাটের দশকের কাছাকাছি সময়, ১৯৫৭ সালে পূজোয় 'সম্ভার' পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকার দুই বাংলার সহযোগিতায় সৃষ্টির আকরণে কথা সাহিত্যে কোন আঙ্গিক কিংবা প্রকরণ চিহ্নের প্রকাশ পাওয়া যায়নি। যা শুধুমাত্র সূচনা বলা যেতে পারে কিন্তু গন্তব্য নয়। তাই সাহিত্য রস পিপাসুদের পিপাসা নিবৃত্ত করার প্রয়াস নিয়েই সম্পাদক শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর আবির্ভাব 'অনিশ' এর মাধ্যমে। আর 'অনিশ' এর হাত ধরে— কথা সাহিত্যে বরাক উপত্যকার অনবদ্য পাঁচজন শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, তপোধীর ভট্টাচার্য, দিলীপকান্তি লস্কর ও নিধিলাল ধর খ্যাত নামা গল্পকারের আত্মপ্রকাশ। গদ্যচেতনা বলতে প্রথম 'অনিশ'-কে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। অরিজিৎ চৌধুরী, গণেশ দে, করুণাকান্তি দাস, মিহিরকান্তি রায়, জগৎ লাহা 'অনিশে'র হাত ধরেই গল্পজগতে পদার্পন।

'অনিশ' সম্পাদক শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী হাত ধরে সাহিত্যরূপী জমিতে বীজ বপনের কাজটি সুসম্পন্ন হয়েছিল। আর সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস থেকেই তিনি বলেছেন—

> *"কাছাড়ের গদ্য আন্দোলন অনিশ শুরু করেছে (এবং আগামী সংখ্যা থেকে) সেটা আরও জোরদার করার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতা"* [১]

আর এই প্রতিশ্রুতি কার্যকর লক্ষ্য করা যায় এক ব্যক্তিশালী স্বচ্ছন্দ গল্পের রীতি ও আঙ্গিকে মিথিলেশ ভট্টাচার্য এক স্বতন্ত্র্য নাম। কাব্যিক আলো-ছায়ায় মায়াবিজড়িত ভাষা গল্পের মধ্যে এক সুরপ্রবাহ সংযোজন করেছিলেন।

স্বপ্ন নিয়ে পথ চলা কিন্তু বাস্তবে তা ষোলআনা সাফল্য হাতে উঠে আসে না। শুধু মাত্র স্বপ্নের রঙের মেলবন্ধন সম্ভব হয়েছিল। আর কাছাড়ের গল্প সম্পর্কে কিছু কিছু আক্ষেপ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল,—

> *"কাছাড়ের সাহিত্যে সুয়োরাণী কবিতার প্রতাপ বড্ড বেশি তাই দুয়োরাণী গল্পকে দৃষ্টিকটুভাবে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে নিজের মালিণ্য ও দৈন্যকে ঢেকে রাখতে হচ্ছে। কাছাড়ে সাহিত্যিক মানেই কবি; গল্পকারদের সংখ্যা প্রকৃত অর্থেই অঙ্গলিমেয়। পত্রিকা নির্ভর কাছাড়ের সাহিত্যে সিংহভাগ দখল করেছে কবিতা।"*[২]

নরম পলিযুক্ত জমি যেমন ফসলের জন্য উৎকৃষ্ট তেমনি গল্পের কৃত্তিস্থাপন 'অনিশ'কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল। যা যুক্তিযুক্ত তপোধীর ভট্টাচার্যের স্বভিমত, বরাক উপত্যকার সাহিত্যে 'অনিশ'কে এক নব তরঙ্গ বা **New Wave** বলে উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ করে গল্পের যে বহুবিধ গল্পের আধার ও আধেয় সৃষ্টি হয়েছিল তা 'অনিশে'র হাত ধরেই। যদিও গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থ 'সাহিত্যে'র পাতায় আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—

> *"হায় গল্প! সাহিত্যের রাজ্য থেকে কবির দল উদ্বাস্তু করেছে তোমাদের। বলতে দ্বিধা নেই, কাছাড়ে কবিদের দলই ছিল, কবির শহর শিলচর আর কবির রাজ্য কাছাড়। শুধু রাজার মতো প্রজা থাকলে তো আর রাজত্ব চলে না। তাই অন্ত্যজ রায়তের মতো গল্পকাররাও দিন কাটান কাছাড়ে। কবিরা এলেন কাছাড় সাহিত্য বাসনে, রয়েও গেলেন রাজার মতো।*

গল্পকাররাও এলেন জনমজুরি খাটতে উদ্বাস্তু হলেন পত্রপাঠ, অদক্ষ এবং সংঘশক্তিহীন শ্রমিক কোন শিল্পোন্নতিতেই সহায়তা করতে পারে না।"[৩]

এই আক্ষেপের ছায়া বরাক উপত্যকার সাহিত্যের অঙ্গনেও প্রতিফলিত হয়েছে। এ উপত্যকার সাহিত্যচর্চা নিশ্চিতরূপে লিটল ম্যাগাজিন নির্ভর। আর বাহ্যিক ও মননের নানান সমস্যার দরুণ পত্রিকাগুলোর আয়ুষ্কাল খুবই কম। স্বপ্ন ও আশা তার সঙ্গে কায়িকশ্রম, চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন পত্রিকার জন্ম দিতে পারেন না; ছোট পত্রিকার ভাগ্যাকাশে বিড়ম্বিত। তাই বহু অন্বেষণে আবিষ্কার করতে হয় অমূল্যরতন।

আর এই অন্বেষণের ফলস্বরূপ সুদূর স্বপ্নের বিলাসী সম্পাদকদ্বয় মিথিলেশ ভট্টাচার্য ও ভাস্করানন্দ শর্মা ওরফে তপোধীর ভট্টাচার্য— প্রাণের উদ্দীপনায় আর মনের তাগিদে 'শতক্রতু' জন্ম দিলেন। আর গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থের যে আক্ষেপ, যে অনুশোচনা তা অনেকটাই দূর করতে সক্ষম হয়ে 'শতক্রতু' পত্রিকা। কারণ গল্পের যে দৈন্যতা, সীমিতা পরিসর ভেঙে বহুবিধ স্বর ও আধুনিকতার সার্থক জোয়ার বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে এই পত্রিকা।

" 'শতক্রতু' এ অঞ্চলের কথাসাহিত্যের জগতে ল্যান্ড মার্কা বিশেষত বাংলা গল্পে নতুনশৈলী, আঙ্গিকে প্রকরণে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ সমস্তই 'অনিশ' এ যার অঙ্কুরোদগম হয়েছিল 'শতক্রতু'তে এসে তার পূর্ণপ্রকাশ ঘটে। অনিশের শ্যামলেন্দু, মিথিলেশ, রণবীর ও অরিজিৎকে নিয়ে শতক্রতু আবিষ্কার করল আরো কয়েকজন শক্তিমান লেখককে অমলেন্দু ভট্টাচার্য, শেখর দাশ, বিজয় দেবরায়, আশুতোষ

দাশ, কৃষ্ণা মিশ্র, অনুশ্রী সেন, তাদের অন্যতম।"[৪]

শেষ পর্যন্ত কবিতার প্রতি সীমাহীন দুর্বলতা কাটিয়ে উৎকৃষ্ট গদ্য রচনা আন্দোলন সবলভাবে কার্যকর হচ্ছিল যা আগামীতে উৎকৃষ্ট মানের গল্প রচনার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক নানা রকম প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে শ্যামলেন্দু, মিথিলেশ, তপোধীর মিলে নতুন স্বপ্নের আশ্রয়ভূমি খুঁজে নিলেন 'শতক্রতু'তে। 'শতক্রতু'ই কাছাড়ের বদ্ধজলাশয়ের আবদ্ধ খুলে স্রোতের ধারা বয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল সাহিত্যের ইতিহাসে। আর প্রচলিত জীর্ণজর্জরিত দৈন্য লক্ষ্যহীন ভাবে পথ আর চলা নয়, পথ চলা এখন নতুন শৈলী আঙ্গিকে প্রকরণে বহুবিধ, সাহিত্যের মহাকাশে স্বপ্নের নক্ষত্রের ভিত্তিভূমি সৃষ্টি করা। স্থান, কাল, সমাজ, সময়, স্বপ্ন সাহিত্যকে আলোড়িত করেছিল। কারণ দেশভাগকে কেউ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, আর পারেনি বলেই সাহিত্যে তার ছাপ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

> *"ষাটের দশক বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে নিয়ে এল একগুচ্ছ আন্দোলন। এবং তাদের ঘিরেই গল্পের পট পরিবর্তন হল। গল্পকারেরা বাস্তববাদী সাহিত্যের প্রেরণায় জীবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গন থেকে তুলে আনলেন পরিচিত সব কাহিনি ও পরিবেশ। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এসবও এল গল্পে। এল অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা। গ্রাম ভেঙে শহর হয়ে ওঠার কথা। এবং অর্থনৈতিক কারণে ভেঙে পড়া মূল্যবোধ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এল পারিপার্শ্বিকের জীবনযাত্রায়।"*[৫]

কোন লেখক বর্তমান সময় ও পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করতে পারে না,

আর পারে না বলেই সময়ের চিহ্ন, ঘটনার চিহ্ন এবং স্বপ্নের আগামবার্তা লেখকের লেখনীতে উঠে আসে, আর এখান থেকেই সার্থকতার পদযাত্রা শুরু করেছে বরাক উপত্যকার গল্প লেখকেরা। এর মধ্যে অনেক গল্প লেখকই শক্তিশালী এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠগল্পকারদের কয়েকজনকে শুধুমাত্র স্পর্শ করে, শেখর দাশের অবস্থান কোন জায়গা; তার কিছুটা প্রয়াস মাত্র করতে চাই এই অধ্যায়ে।

বরাক উপত্যকার গল্প সাহিত্যে শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী বিশিষ্ট গল্পকার এবং বিশেষ উদ্যোক্তার আসন দখল করে আছে। তা আমরা লিটল ম্যাগাজিন 'অনিশ'-এর ইতিহাস আমাদেরকে শুধু জানিয়ে শেষ হয়ে যায় না, সহজ সরল মস্তিষ্কের কোষগুলিকেও নাড়িয়ে প্রমাণ করে যে, স্বপ্ন ও লক্ষ্য উচ্চ থাকলে, যে কোন পরিস্থিতি হোক না কেন, তার লক্ষ্য স্রোতকে কিছুটা ধীরগতি করতে পারে কিন্তু বেঁধে রাখতে পারে না, আর তাঁকেও পারেনি। শ্যামলেন্দুর গল্পের প্রকাশভঙ্গি খুব সুসংহত কেন্দ্রাতিগ ও দৃঢ়বিন্যস্ত।

> *"গল্প-ভাষায়, গল্প-ভাবনায়, গল্প-বস্তুর বিন্যাসে ঠিক কতখানি রূপান্তর ঘটে গেছে, তা বোঝার জন্যেও আমাদের বার বার ফিরে যেতে হবে শ্যামলেন্দুর গল্পবিশ্বে।"*[৬]

তাঁর গল্পে নিজস্ব আশাবাদী প্রকরণ জীবনবোধ বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে বিঘোষিত। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়া বিপরীতে স্রোত বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। তার গল্পের পাঠে বিচিত্র সব অনুষঙ্গ ছিন্ন করে মনের নতুন জানালা খুলে দেয় পাঠকের—

> *"... এই গল্পকার বহুদিন আগে বরাক উপত্যকায়*

কল্প-বিজ্ঞানের গল্প লিখেছেন। আজকের নবীন পড়ুয়াদের মধ্যে কেউ একজন ভাবতেই পারেন, বন্ধ্যা আর স্থবির সমাজ ও সময়ে ক্লান্ত এই গল্পকার এভাবেই পঙ্গু বাস্তবতা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন।"[৭]

তাঁর গল্পবিশ্বে চিহ্নের রূপান্তর ঘটে গেছে নানা আঙ্গিকে ও প্রকরণের মাধ্যমে গল্পগুলির ভাবনাবিশ্বে।

গদ্যভাষা ও গদ্যরীতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য। এ উপত্যকায় বাংলা সাহিত্যে গদ্য আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব তিনি প্রথম কল্পবিজ্ঞানের ধারা নিয়ে আসেন, যা এ অঞ্চলে এর আগে ছিল না। এমন কি সাহিত্য প্রেমিক বাংলা সাহিত্যে গদ্য আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য—

"এ উপত্যকার প্রথম বাংলা গল্পের পত্রিকা 'অনিশ' এর সম্পাদক ছিলেন শ্যামলদা। এই লিটলম্যাগ বের করার করার জন্য শ্যামলদাকে তাঁর নিজের হাতঘড়ি, গলার সোনার চেন, অঙুলের সোনার অংটি এমনকী একটি ট্র্যাঞ্জিস্টার রেডিও সেট বিক্রি করে ছাপাখানার ঋণ শোধ করতে হয়েছিল।"[৮]

তিনি একজন অসাধারণ মানবতাবাদী, প্রকৃত মানুষ, সমাজ ও সত্তাসচেতন গদ্যশিল্পী। মানুষের সাধারণ জীবনযাপনের দৈনন্দিনের জীবন্ত ছবি তোলে ধরেছেন আমাদের সামনে— সমস্যা ও সমাধানের খোঁজে।

আসামে সবচেয়ে বড় সমস্যা বিদেশি বা বহিরাগত সমস্যা। দ্বিজাতিতত্ত্বে দেশভাগ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যেসব মানুষ দেশভাগের আদিপাপের বলি হয়ে চলে এসেছিল এপারে তাদের আমার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার এক মর্মস্পর্শী

'আশ্রয়' গল্প। বাস্তুভিটে হারিয়ে ছিন্নমূল মানুষের বিপন্নতার কাহিনি গল্পকার বাস্তব অভিজ্ঞতায় তা প্রতিফলিত করেছেন।

গল্পের শুরুতে জীবনযুদ্ধের অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক বৃদ্ধের সুখী পরিবার পুত্র-পুত্রবধূ ও নাতিসহ। মাটি ও প্রকৃতির নিবির সান্নিধ্যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে।

একবার চোখ দুটো চারদিকে ঘুরিয়ে আনে বৃদ্ধ। নারকেল গাছ দু'টো চিকচিকে পাতা নেড়ে হাওয়া করে। ঘরের কার্নিশে কয়েকটি চড়ুই টুইটুই শব্দে বয়ে আনছিল একটা স্থায়ী সুখের আনন্দ। জীবনের এটুকু আনন্দের জন্য অনেক অনেক বসন্তকে ক্ষয় করতে হয়েছে বৃদ্ধকে।'

এই অঞ্চলে উদ্বাস্তুর মত এই বৃদ্ধ ও অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতিবিজোড়িত আশ্রয় খুঁজে নেয়।

সামাজিক দায়-দায়িত্বে, আচার অনুষ্ঠানে বৃদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বহু যুদ্ধের সঙ্গী নিভাকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ বিষন্নতা কাটিয়ে ওঠে এদেশের আলো-বাতাসের অপরূপ সৌন্দর্য্যে নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছে—

> *"এই জলমাটি কবেই আপন করে নিয়ে ভুলিয়ে দিয়েছিল জন্মসূত্রে এ ভূমি তার নয়। আজকে তার চিন্তা-ভাবনা, আশা-আনন্দ সবকিছুই এই মাটিকে ঘিরে।"*[৯]

কিন্তু এ অঞ্চলে অস্থির সময়বোধ ও দেশভাগের অভিশাপে লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা-স্বপ্ন ধূলোয় মিলিয়ে নিঃশেষ করে দেয়। বৃদ্ধের ছেলে অরিন্দমের চিঠিতে তারই দ্যোতনা— 'গ্রামে বসবাস আর সম্ভব কিনা'।

শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর গল্পে বাস্তব আর মনের গভীরের জন্ম নেওয়া আবেগ সুসজ্জিত কল্পনার আকরণ। তিনি 'গল্প লেখার গল্প' প্রবন্ধে গল্প জন্ম বার্তা তুলে ধরেন—

> *"আসলে কিছু কিছু ঘটনা ও মানুষ মনের মধ্যে দাগ কেটে যায়। কখনও কখনও মনের মধ্যে অনুরণনের সৃষ্টি হয়। সে ঘটনা বা মানুষ নিয়ে মন একান্তে জাবর কেটে চলে। শেষ পর্যন্ত এমন এক তাগিদ অনুভূত হয় যে তখন কাগজ কলম নিয়ে বসতেই হয়।"*[১০]

আর এই বাস্তবতাবোধ এবং মানুষের অস্থির জীবনবোধ গল্পকারের গল্পে উপস্থিত। সামাজিক সত্তা এবং সময়ের বাস্তবতা তিনি বৃদ্ধের মাধ্যমে সমস্ত দেশভাগের ফলে উৎখাত মানুষের অনিশ্চিত জীবন কাহিনি তুলে ধরেছেন। বাঙালির আশ্রয় ভালোবাসার কোন স্থায়ী ঠিকানা যেন নেই। তাদের প্রীতি-মায়া, বিশ্বাস, নিশ্চিন্ততার-আশ্রয় কেড়ে নিয়ে নোটিশ আসে—

> *"ভূমিপুত্র ছাড়া কারও স্থান হবে না এ রাজ্যে।"*[১১]

বরাক উপত্যকায় 'আশ্রয়' গল্পটি আমাদের নিজস্ব বাস্তব সম্পৃক্ত। উদ্বাস্তু রবিদেশী বা বহিরাগত বাঙালির জীবন বিপন্ন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে ব্যক্তিসত্তাকে উন্মুল করে দেয়, তা গল্পকার লক্ষ্য করেছেন। বাঙালির অস্তিত্বের অবক্ষয়ের ভয়াবহতা গল্পত্বের আধেয়।

ব্যাক্তি-পরিসর নিজস্ব অভিজ্ঞান থেকে সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অতীতের কিছু মানুষের ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে নির্দোষ সহজ-সরল বাঙালিকে। বৃদ্ধের জীবনের সমস্যা ও সঙ্কটের মাধ্যমে আজকের বাঙালি মানুষের

সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।

ঈশ্বরের সৃষ্টি সুন্দর নিষ্ঠুর মানবিকতা মানুষকে আশ্রয়হীন করে দেয়। পনেরো দিনের মধ্যে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশে বৃদ্ধের সেই অতীতের সংগ্রামের কথা মনে পড়ে যায়—

> *"সেই কবে ছোট্ট অরিন্দমকে বুকে নিয়ে একবস্ত্রে ভিটেমাটি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালাতে হয়েছিল প্রাণের মায়ায়। সেদিন মাটির সঙ্গে নাড়ির যোগসূত্র নিপুণ হাতে কে কেটেছিল জানে না বৃদ্ধা কিন্তু ভাসতে ভাসতে যেখানে নোকর ফেলার সুযোগ পেয়েছিল সেটি এই মাটি। তারপর ভাষা এর না হলেও আত্মীয়ের আন্তরিকতায় পুরানো স্মৃতির ওপর কবেই পলিস্তর জমে জমে আশ্রয়ের দ্বীপ হয়ে উঠেছিল এ মাটি।"* [১২]

কখনও দ্বিজাতিতত্ত্বে, কখনও ভিন্ন ভাষার অভিশাপে নিরপরাধ বাঙালি মানুষের জীবন স্বপ্ন বিপন্ন। স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধের সহজাত উদ্ভুত প্রশ্নে পাঠকেরও ক্ষেত্র প্রসারিত করে দেয়। এভাবেই কি বাঙালি শুধু বিতাড়িত হবে দেশ থেকে দেশান্তরে।

গল্পে অস্থির ও জ্বলন্ত সময়ের এই প্রতিবেদন হিসেবে গল্পকার মানুষের আশ্রয়ের খোঁজে গড়া ও প্রচেষ্টাকে এক চিরকালীন সত্যের অভিমুখী করে তোলে। সর্বহারা মানুষের কোনো স্বদেশ নেই— এই সামাজিক সত্য ধরা পড়ে বৃদ্ধের বয়ানে। নো ম্যানস ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের অমোঘ জীবন-দার্শনিকের বাচনে সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর মানবসত্যের ব্যঞ্জনা বয়ে আনে—

"...প্রথমবার বেরিয়েছিল ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে, আর এই দ্বিতীয়বার চলতে হচ্ছে ছোট্ট নাতির হাত ধরে। আশ্রয়ের খোঁজে মানুষের এ যাত্রার বোধহয় শেষ নেই।"[১৩]

'মানুষ মানুষের জন্য' গল্পে গল্পকার মানুষই মানুষকে কিভাবে শুধু ভিন্নভাষাবাহী হওয়ার জন্য অত্যাচার শোষণ করে তারই আখ্যান। বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বাঙালি খেদা অসহনীয় নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে।

শ্যামলেন্দু একজন সমাজসচেতন শিল্পী, সাথে সাথে মানবদরদীও বটে। জীবনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাতে শুধু মানবসেবার মূল আদর্শ নিজেকে নিয়োজিত করে গেছে। অনেক কষ্টের, অনেক বলিদান দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতা, আর সেই স্বাধীন দেশে মনুষ্যত্বহীন শাসকগোষ্ঠী ভাষার ভিন্নতার জন্য হত্যার তাণ্ডব লীলায় সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যয়কে দিকে ঠেলে দেয়— তা লেখক যেন কোনোমতে মেনে নিতে পারছিলেন না। এই গল্পে জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে একই রক্তের মানুষ গড়া, সেই দুঃসহনীয় চিত্র পাঠকের মনে নাড়া দেয়।

প্রেম-ভালোবাসা কোনো জাতি-ভাষা-ধর্ম মানে না, শুধু নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবাসতে জানে। ভালোবাসার গভীর মেলবন্ধন বাঙালি হীরেন আর অসমীয়া রূপালির চিত্তে চিরকাল কাছের মানুষ করে তোলেছে।

সমাজের জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই যদি ছোট ছোট স্কুল বিদ্যার্থীর মনে ভিন্ন ভাষাভাষীর জন্য বিপথগামী পথের সন্ধান দেয়, তবে কোন ভবিষ্যতের আলো দেখবে তারা। এই অনিশ্চিয়তার লেখকসত্তাকে আমরা দ্বিধাগ্রস্থ হতে দেখি—

"খাওয়া-দাওয়া শেষ করে অফিসে বেরুবে। এমন সময় পাশের বাড়ির নরেন শইকিয়ার ছোট্ট ফুটফুটে ছেলেটি এল। ওর সঙ্গে হীরেনের খুব ভাব। একটা কনভেন্ট স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে।

— আংকল, আপনি বাঙালি নহয় জানো? ওর আজব প্রশ্নে দরজায় তালা দিতে ভুলে যায়।

— সোনাটি, এনে কথা কারু কিয় সুবিছা?"[১৪]

ওর জবানিতে হীরেন জানতে পায় গতকাল স্কুলে কয়েকজন গিয়েছিল— আজ থেকে স্কুল বর্জন। বাঙালিরা আসামের সর্বনাশের মূল ইত্যাদি নানা কথা ছাত্রদের বোঝানো হয়েছে।

হীরেন ও রূপালির আবেগ ভরা ভালোবাসা গল্পবয়ানে অপরসত্তার বার্তা বহন করে। তাদের নিষ্পাপ সম্পর্ক ভাষা কিংবা ধর্ম দেয়াল হয়ে দাড়ায়নি। আসামের সমস্যা মানে আসামে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের সমস্যা। কোনো ভিন্ন ভাষাবাহী অন্য ভাষাকে সংকটে ফেলতে পারে না—

"যাদের ভাষা-কৃষ্টি গতিশীল নয়, তাদের মৃত্যু অনিবার্য। যে জাতি গতিশীল— তার ভাষাও গতিশীল— ক্রমবিবর্তনে তার কৃষ্টি পরিশীলিত হবে। অসমিয়া সাহিত ও কৃষ্টিকে যারা ভাল করে লক্ষ্য করবেন তারাই বুঝবেন সেটি কোনও জড়বস্তুর মত থেমে নেই। তার গতিশীলতাকে বাঙালির কৃষ্টি কেন, পৃথিবীর কোনো কৃষ্টিই গ্রাস করতে পারবে না।"[১৫]

সমস্ত অঞ্চল জুড়ে আন্দোলনের নামে পরিকল্পিতভাবে বাঙালি উৎখাত

পর্ব চলছে। আর তার মধ্যে প্রাণ হারাতে হয়েছে। মানুষ মানুষের জন্য এই মূল্যবোধ থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে ভিন্নজাতির সংকীর্ণ বৃত্তে সন্ত্রাসের রূপ ধারণ করল, সব মূল্যবোধের এখানে জলাঞ্জলি ঘটল।

গল্পের কেন্দ্রভূমি আলোড়িত করে বিরাজ করে দুই সম্প্রদায়ের প্রেম। গল্পকার শত গরলের মাঝে প্রেম নামে অমৃতের আনাগোনায় জীবনে মিথ্যার আড়ম্ভর চূর্ণ-বিচুর্ণ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

স্বজাতির হাতেই যখন রূপালি রক্তাক্ত হল। আর প্রেমহীন, ভালোবাসাহীন স্বজাতির রক্তে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই; কিন্তু হীরেন সব নিস্তব্ধতা ভেঙে ভালোবাসার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গল্পে নিজস্ব আশাবাদী প্রকরণ জীবনবোধ বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে ঘোষিত। বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ এবং জীবনের প্রতি-লেখকের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তা আসলে গল্পবয়ানে বিশেষ রীতিতে অনবদ্য।

তাঁর অনেক গল্পেই চিহ্নায়কের পরিভাষা লক্ষ্য করা যায়। 'এক মন অন্য দেহ', 'ফাঁদ', 'স্বপ্নহীন', 'ঘুম' এর মতো গল্পবিশ্বে বয়ানে জীবনের ভেতরকার অজস্র বাস্তবিক অনুভবের অনুছায়া লক্ষ্য করা যায়। 'প্রেমের চেয়েও গভীর' অনুগল্পে একটা সহজাত মানুষের গভীর হৃদয়ের দ্যোতনা ও আশার গভীর চেতনা গল্পকারকে অনবদ্য করে তোলে। 'যে গল্পের শেষ নেই', 'একটি মৃত্যু এবং তারপর' পড়তে পড়তে মনে হয় বর্তমান জটিল সময়ের গ্রন্থনায় দ্বিধায় রয়েছেন। 'মানুষ মানুষের জন্য', 'পাকদণ্ডি', 'মন-মৃগয়া', 'অক্টোপাস', 'শুভেন্দুর হেরফের' গল্পের স্থিতিস্থাপকতাই শ্যামলেন্দুর গল্পবিশ্বের অভিজ্ঞান। প্রীতি ও ভালোবাসার প্রত্যয়ে গল্পকারের গল্পভাবনার সন্ধান অন্যমাত্রা যোজন করেছে।

পথকে খুঁজে নিতে বরাক উপত্যকার অনবদ্য ছোট গল্পকার মিথিলেশ

ভট্টাচার্য বারে বারে নিজেকে হারিয়েছেন ঐ অঞ্চলের স্তিমিতমন্থর জীবনপ্রবাহে। আর ষাটের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক সাহিত্য ধারা-গল্প লিখব কিন্তু বিশেষ কোন কাহিনি বা ঘটনা প্রাধান্য থাকবে না— এই গল্পহীন গল্প মিথিলেশের গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বরাক উপত্যকার সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনপ্রবাহের নানা সম্পর্কের যে নিবিড়টান, তা গল্পকারের গল্পে যেন চিরপরিচিত চরিত্র পাঠকের কাছে মৃদু স্বরে গল্প বলে যায়। গল্পকার তৎকালীন ভৌগোলিক-রাজনৈতিক জীবন-যাপনকে অর্ন্তসার করতে গিয়ে তিনি শুধু হারিয়েছেন একক নির্মিত পথে যা শুধু প্রাকৃত জীবনে বহিরঙ্গ ছুঁয়ে আসে বিভিন্ন চরিত্রের বাচন। ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি এবং আত্মকেন্দ্রিক অর্থসর্বস্ব সুবিধাবাদী-রাজনৈতিক দাপট ষাটের দশকের গল্পের বিষয়বস্তুতেও এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যা বরাক উপত্যকার গল্প আন্দোলনের ভিত্‌শুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়েছিল। যা 'শতক্রতু'র প্রস্তাবনার সংখ্যা 'ছারপোকা' এবং প্রথম সংখ্যায় 'কেশবলালের ভুমিকায়' গল্পহীন গল্পের আদল পাঠকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। 'ছারপোকা' গল্প শুরু হয়েছে পূর্বের ক্ষিপ্ত ঘটনার রেশ ধরেই। নিম্নবর্গীয় মানুষের অতিপরিচিত অতি সাধারণ ঘটনা, সাধারণ মানুষকে কিভাবে বিব্রত করে এবং গল্পে তার ইঙ্গিত আছে—

> *"শালা কচু করেছে তোর মাদুলী, ভাল মন্দ টের পাই না' ..., ভাবে মাদুলীটা হয়তো ভাল করছে না, কিছু অমঙ্গল তো—"*[১৬]

বরাক উপত্যকার সহজ-সরল মানুষগুলির সরলতার প্রবণতা বাস্তবের অর্ন্তবর্তী রূপকে অস্বীকার করে বহু বিচিত্র রূপের আশ্রয়ে জীবনের মূল্যবোধের সাশ্রয়। কারণ গল্পকারের স্বপ্ন সুন্দর প্রগতিশীল বরাক। যেখানে ছাপপোকার নানা প্রতিবন্ধকতা আড়াল থেকে শুধু রক্ত শুষে বিব্রত ও ব্যতিগ্রস্থ করে

তুলেনি, সাধারণ সহজ-সরল জীবন যাপনের পথটুকু বন্ধ করে দেওয়ার ইঙ্গিত গল্পে স্পষ্ট।

মিথিলেশের 'বকুল' 'গ্রন্থি' 'জন্মদিন' কিছু শব্দ বাতাস এবং মলিন পৃথিবী প্রাত্যহিকতার ডামাডোলে প্রতুল, 'নিহিত স্বপ্নের মায়া', 'মৃদুলা' গল্পে জীবন রসিক জীবনবিমুখ মানুষের প্রেম-অপ্রেম এবং মধ্যবিত্ততার দারিদ্র্য দোলাচলবৃত্তিতে দ্বান্দ্বিক মানসিকতায় পীড়িত মানুষ-মানুষীর জীবন্ত ছবি এঁকেছেন। নানা চরিত্র সৃষ্টি এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিচ্ছুরণ মিথিলেশ আহরণ করেছেন জীবনের সব বিচিত্র জটিল পথে। নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব জগতের ঘটমান বয়ানের পাণ্ডুলিপি নিজেকে নিজেই প্রতিনিয়ত নির্মাণ করে চলেছে। আর গল্পবিশ্ব ও গল্পবীক্ষা নিয়ে মত বিনিময় করতে গিয়ে সাধন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

"ছোটগল্প হচ্ছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার একটা কোলাজ।"

এ অঞ্চলের নানা প্রতিবন্ধকতার গল্পের বয়ানে শুধু ফিরে ফিরে আসে স্মৃতির আকল্প।

'শতক্রতু'র সম্পাদক মিথিলেশ ছোটগল্প ভুবনে স্বমহিমায় উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর গদ্য কাব্যিক প্রসাদগুণ সম্পন্ন শব্দের চাতুর্যে মুখর ও রস প্রধান 'অর্থবছর আগের একদিন' ও কক্ষপথ গল্পদুটিতে তিনি নূতন দিক নির্দেশ করেছেন। বাস্তব জগতের আড়ালে চেনা-অচেনা অদৃশ্যের ফাটল কাটিয়ে ভাষার সুরছন্দে পরিচিতকে অপরিচিত আর অপরিচিতকে পরিচিত করানোর কৃৎকৌশল পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। তাঁর গল্পভাষায় অতিরেক নেই আছে সহজ-সারল্য মাধুর্যমিশ্রিত লাবণ্য। 'জগৎ পারাবারের তীরে', 'গোপাল যখন বিচারক', 'ইয়াসিন', 'আমি এবং মৈত্রীসূত্র', 'দৌড়', 'সময়' মিথিলেশের অসাধারণ গল্প। গল্পের

চরিত্রগুলো বাস্তবজগতে বসবাসকারী চেনা-জানা মানুষগুলো পাঠকের কাছে ভিড় করে— যা পাঠক ও গল্পকারের মধ্যে ও দ্বিরালাপের বার্তা বহন করে। শিব ভট্টাচার্য মিথিলেশের গল্প আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"প্রতীক গল্পগুলোতে মিথিলেশ অসাধারণ। যেমন তাঁর চরিত্র সৃষ্টি তেমনই তার ভাষার ব্যবহার।"[১৭]

জীবনের আলো ছায়ায় অসুন্দরকে ঢেকে সুন্দরতম ছবির আলপনা এঁকেছেন তিনি। এই বিষামৃত মেলা পৃথিবীতে অনন্তকে মন্থন করে পাঠকের কাছে উপহার দিয়েছেন এক মূল্যবান মণিমুক্তা।

বরাক উপত্যকায় নির্বাচিত গল্পে মিথিলেশের 'চৈত্রপবনে' বহুস্বরান্বিত কথাগ্রন্থনার নিদর্শন হিসেবে স্মরণীয়। চারদিকে ব্যাপ্ত মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙন সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। ভাষার কোমল লাবণ্য মূলত গল্পহীন গল্পের নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যেন চেনা বাস্তবের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় অদৃশ্য ফাটল— যা আগের মতো থাকে না। 'চৈত্রপবনে' গল্পটি কথা গ্রন্থনায় বহুস্বর পরিলক্ষিত হয়, যা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। চৈত্র মাসের অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনার মধ্যে শুরু হয়— যা পাঠক মাত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করে রক্তাভ-গেরুয়া পড়ে যে দাঁড়িয়েছে পথরোধ করে তার নাম চৈত্র। নামটায় কেমন উদাস উদাস গন্ধ৷ কৃষ্ণচূড়া পলাশ অশোক আরো হরেক রক্তিম ফুলে এমন কী সেইল সেইল বা গ্র্যান্ড রিডাকশন লেখা অফুরন্ত টুকরো শালুতে চৈত্র এক বৈচিত্র্য নিয়ে হাজির। কড়া মিঠে হলদে রোদেও কেমন রক্ত ছিটে লেগে আছে।

নৈসর্গিক বর্ণনায় গল্পরে ভাবনা ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যায় লোকায়ত অনুপুঙ্খ সহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিক চোরাটানে। তা কথাবয়নের কৌণিকতা ও স্মৃতিরঞ্জিত বিষাদ অস্তিত্বের অসঙ্গতির সঙ্গে জড়িয়ে যায় সোনাহর

চৌধুরীর প্রতীক উপস্থিতি।

আর দুরন্ত চৈত্রপবনে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন এবং সংসার ঘরবাড়ি সব যেন প্রকৃতির সাথে সাথে দেউল হয়ে যায়। ঐশ্বরিক ভাবনা জীবনের ভাবনার সাথে সেই কল্পনায় কৈশোরের সোনারকাঠি রূপোর কাঠি ছুঁয়ে যায় অন্তরে। উত্তম পুরুষের কথকতায় গল্পটি দ্বিবাচনিক আকরণে নূতনত্ব নিয়ে আসে— যা রচনাভঙ্গির বয়ানে অসাধারণ হয়ে ওঠে। 'পকেটমার' গল্পে চিরবাস্তবের এক সর্বকালের চিরন্তর ভাষা পরিলক্ষিত হয়—

> *"ছায়ার সঙ্গে শরীর মিশিয়ে নির্দিষ্ট শিকারের পেছনে চিতার ক্ষিপ্রতায় হাঁটছে। আক্রান্ত। অভ্রান্ত।"*[১৮]

বরাক উপত্যকার স্তিমিত মন্থর চলমান জীবন প্রবাহে বাস্তব জীবনে সংঘর্ষে মানুষ বিভ্রত এবং অসহিষ্ণু ক্ষিপ্রতায় জন্ম-মৃত্যু আবেগে স্মৃতির মাঝে শুধু ভিড়ই করে না অন্তরসত্তাকেও নাড়িয়ে দেয়।

সহজভাবনা, সহজকথা, বহুমাত্রিক চিহ্নায়ণের অবকাশ ফুটে ওঠে বিভিন্ন গল্পে। 'সন্ধিক্ষণ', 'কর্কটক্রান্তি', 'অনালোকিত', 'গ্রীষ্মের দুপুরে', গল্পের পটভূমি অন্য গল্প থেকে ভিন্ন এবং বিনির্মাণের বয়ানে নতুনত্ব দেখা যায়। 'গ্রীষ্মের দুপুর' গল্পে গল্পভাষা ও গল্পভাবনা পাঠক চিত্তকে নাড়িয়ে নতুন ভিত রচনা করে—

> *"বুঝলানি বাবু, মাইনসে কয় বুবার শত্রু নাই, কী মিছা কতা, গাছের কী পরিমাণ শত্রু, পুকা-মাকড়-পিঁপড়া-ঝড়-তুফান, টাইমো ফল দিতা কিলা, তবুও আমি কইমু গাছের ইমান আছে, মাইনসর লেকান বেইমান নয়, অউ চাইন ভাগুয়ার পেঠফুলা, ভিতরে ফুল অইছে, ফল জরুর দিবো—।"*[১৯]

জীবনের আলোছায়ায় অসুন্দরকে ঢেকে সুন্দরতম ছবির আলপনা এঁকেছেন তিনি। এই বিষামৃত মেলা পৃথিবীতে অনন্তকে মন্থন করে পাঠকের কাছে উপহার দিয়েছেন এক মূল্যবান মণিমুক্তা।

মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক সংকটের দ্বন্দ্বের সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্তির আকাঙক্ষায় মগ্ন থাকেন মিথিলেশ তাঁর গল্পে। এর মধ্যেও গল্পের পাত্রপাত্রীরা আধুনিক যুগের জটিল কৌণিকতায় জীবন-জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত।

'আঁচল' গল্পে মায়ের সহজাত ভালোবাসায় লালিত পালিত সন্তান কিভাবে বর্তমান যুগে অবহেলায় অবজ্ঞায় নিঃসঙ্গ অসহায়ভাবে বাবা-মাকে ছেড়ে দেয় তারই ব্যঞ্জনা গল্পের ভাবনায়।

বরাক উপত্যকায় নির্বাচিত গল্প সংকলিত মিথিলেশের 'চৈত্রপবনে' বহুস্বরান্বিত কথাগ্রন্থনার নিদর্শন হিসেবে স্মরণীয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবতলের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। ভাষার কোমল লাবণ্য মূলত গল্পহীন এই গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। 'চৈত্রপবনে' গল্পটি কথা ও গ্রন্থনায় বহুস্বর পরিলক্ষিত হয়।

এই উপত্যকার ভ্রাতৃ-সুলভ নমনীয়তার ফলে মিজো, নাগা, খাসি, মণিপুরী, ত্রিপুরী, অসমিয়া ও অরুণাচলিরা একে অন্যের প্রতিবেশী। এসব জাতি জীবনযাত্রা, আচার অনুষ্ঠান, প্রেম-প্রীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, এত আকর্ষণীয় ও বিচিত্র যে লেখকের লেখনীতে নতুন ভুবন যোগ করে। সাহিত্য ভুবনে অরিজিৎ চৌধুরী তাদের জনজীবনের সহজসরল বার্তা পাঠকের কাছে উপস্থাপন করে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন।

দেশভাগ ও ছিন্নমূল অবস্থান থেকে জন্ম হয় অস্তিত্বের সঙ্কট এবং বিপন্ন

জীবনবোধের যন্ত্রণা। শুধু জন্মমাটি থেকে উচ্ছেদ, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় ভারাক্রান্ত ইতিহাস তাই নয়, সীমান্তের পাশে যারা সাধারণ মানুষ বসবাস করেন, তাদের জীবন গাঁথা ও মর্মান্তিক। সীমান্তে বসবাসকারীর মানুষের জীবনপ্রবাহ, শিক্ষা-দীক্ষার সার্থক চিত্র গল্পকার কথক আর চরিত্রের আঞ্চলিক ভাষায় অসামান্য শিল্পকৃতির নিদর্শন আছে 'সামসুলের সীমানা' গল্পে। ভাষা এবং বয়ানে দরিদ্রশ্রেণির সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই এই গল্পের উপজীব্য হয়েছিল।

বরাক কুশিয়ারার গল্পে 'সামসুলের সীমানা' গল্পটিতে দেশভাগের ফলে সীমান্তের পাশে বসবাসকারীর জীবনযাত্রার সামূহিক বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। দিল্লি, গৌহাটি শহরের বড় বড় অফিসার, বি.এস.এফ., পুলিশ, ছাত্রনেতা ও সাংবাদিকেরা কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে যেসব ভারতীয় গ্রাম রয়েছে তাদের জীবন সংগ্রামের সহানুভূতি প্রকাশ না করে দুঃখজনকভাবে মানবিক সর্বগ্রাসী যান্ত্রিকসভ্যতাসুলভ আচরণে উপহাস করে গেছেন। নিত্যদিনের সমস্যায় আলো না দেখিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ বন্ধ করতে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়ায় ইলেকট্রিফাইড করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে সহজ সরল সামসুলের আর কুদ্দুসের বয়ানে তাদের নির্যাতনের কথা তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে—

> *"আইচ্ছা, অনুপ্রবেশকারী যে বেড় ছইলে মরি যাইব। আর আপনে-আমি যদি বেড়া ছই তে আম্‌রার কিতা অইব?*
>
> *— তে আমরাও মরি যাইমু।*
>
> *— আঁতকে ওঠে সামসুল, 'হায় আল্লা, ইতা কিতা কইন্? আমরা ভারতীয় নাগরিক অইলেও বেড়ায় আম্‌রারে শক মারব নি?*

— অয়, মারব।”[২০]

গল্পে বোকা সামসুল দরিদ্র-শোষিত শ্রেণির আসল শত্রুদের কোনোদিন সনাক্ত করতে পারেনি, পারবেও না। এভাবে সীমান্ত রেখা কিভাবে সহজ-সাধারণ জীবনযাপন ব্যতিগ্রস্থ করে তুলে তারই প্রতিবেদন গল্পের আকরণে উদ্ভাসিত হয়। দেশভাগের ফলে হিন্দু বাঙালিদের মন-মানসিকতা, জীবনদৃষ্টির অসহায়বোধ অরিজিতের অসামান্য দলিল ‘নিরালম্ব’ গল্প। এই গল্পে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু মানুষের হৃদয়ের আর্তির বয়ান বাস্তবতা আর ভাবনার এক ভিন্ন আখ্যান।

গল্পের প্রধান চরিত্র বাংলাদেশের সৌম্য সংখ্যালঘু হিন্দুদের শোষণ-যন্ত্রণা তিক্ততা থেকে পরিত্রাণের জন্য বরাক উপত্যকায় পাকাপাকি ভাবে চলে আসার বাসনা।

তাই আশ্রয়ের সন্ধানে আত্মীয়-স্বজনের কাছে ঘুরে বেড়ায় আর অপ্রত্যাশিতভাবে ছিন্নমূল হয়ে আসা নানা প্রতিকূল পরিসরে বার্তা ফুটে ওঠে—

> *“দ্যাখ সৌম্য, আমরার বাবা-মাই এ দেশে অনেক আগে আইছইন। আমরার জন্মকর্মও ই দেশো। কিন্তু অইলে কিতা অইব। আমরার হাতে নিজেরার নাগরিকত্বর কুনো প্রমাণ নাই। বানাই দিল ডি. ভোটার। অর্থাৎ ডাউটফুল ভোটার। আমরার ছেলেমেয়েরার ইনো কুনো চাকরি নাই, রুজি-রোজগারর কুনো ব্যবস্থা নাই। গুণ্ডামি-ছুঁচামি-ঠগামি করিয়া যদি তুমি বাঁচতায় পারো তো বাচো, আর নায় মরো।”*[২১]

কারণ ভারতীয় সাধারণ সংখ্যালঘু রিক্সাচালক হওয়া সত্ত্বেও তার যে আত্মশক্তি ও সাহস এর পরিচয় পাই, তা সৌম্য বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে অনুপস্থিত। বিবেকহীন ভাবে তাদের শোষম পাঠকদেরকেও বিব্রত করে। যখন আমাদের সমাজ সংসার আধুনিক যুগের সামূহিক সুখ-সুবিধায় দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে— সেখানে মানবিক মূল্যবোধ ও সহানুভূতির হারিয়ে জন্ম নিয়েছে ভীতি ভয় আর নিরাপত্তার অভাব—

> *"সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও একজন সামান্য রিক্সাচালকের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে লক্ষ্যণীয়, বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে হাজার কোটি অর্ন্তভেদী সার্চ লাইট দিয়ে খুঁজলেও কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। হিন্দুরা সেখানে সদা সন্ত্রস্থ, তটস্থ।"*[২২]

গল্পকারের এই বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিসরে যেন নির্যাতিত হিন্দু মানুষের সামাজিক ও মানসিক অবস্থান তুলে ধরেছেন। আমাদের দৈনিক পত্রিকার সংবাদেও বাংলাদেশের হিন্দু মানুষের অমানবিক অত্যাচারের করুণকাহিনি অমানুষিকতার সাক্ষ্য দেয় বর্তমান সময়েও।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিঃ দৈনিক যুগশঙ্খে প্রকাশিত এক সংবাদে বর্তমানেও যে হিন্দুরা অমানুসিক যন্ত্রণার ভুক্তভোগী এবং তার মূল আধার দ্বিজাতিতত্ত্বে বিভক্ত দেশভাগের জন্য—

> *"বাংলাদেশে ২৮ হিন্দু পরিবারকে পণবন্দি করে নিগ্রহ বাড়ি-ঘর হামলা ও লুটপাট, মহিলাদের শ্লীলতাহানি ঘটনাও ঘটেছে।"*

প্রকৃতঅর্থে দেশভাগ সমস্ত হিন্দু মানুষদের নানা সমস্যা জর্জরিত, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ব্যথায় অস্বস্তিকর বাতাবরণ সৃষ্টি করে তারই বাস্তব আকরণ গল্পভাষায়। জন্মভূমির টানে যারা রয়ে গেছে পূর্ববাংলায় আর প্রাণে বাঁচার তাগিদে যারা এসে গেছে— তাদের জীবনে রচিত হল এক আরো বিব্রত সমস্যা। আত্মীয়-স্বজনদের অনুপস্থিত, একে অন্যের প্রতি টান, হারানোর ব্যথা এবং নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মানসিক যন্ত্রণা— যেন প্রামান্য দলিল। দেশভাগের অভিশাপ থেকে আজও বাঙালি সমাধানের উৎস খুঁজে পায়নি। এই গল্পে তার তাৎপর্যপুর্ণ নিরীক্ষা।

তাঁর 'পু ঘোষ', 'বাঁক' বা 'দোলাচল' এর মতো দীর্ঘ গল্প বাংলা সাহিত্যের বিপুল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। এ উপত্যকার গল্পে তিনি আধুনিকতার প্রবর্তক৷ জীবনকে দেখার যে অনায়াসলব্ধ সারল্য তাঁর গল্পকে যথার্থ মূল্য প্রদান করেছে।

রণবীর পুরকায়স্থ বরাক উপত্যকায় গল্প সাহিত্যে নতুন সংযোজন। 'মিনির হাসি', 'রনজন আসছে', 'তরমুজ' ইত্যাদি গল্পের পর্যায় অতিক্রম করে রণবীর আজ ভিন্ন পথের যাত্রী।

'রনজন আসছে' রণবীর পুরকায়স্থের গল্প জগতে একটু স্বতন্ত্র্যতার দাবি রাখে। নান্দনিক আধুনিকতার প্রতি তাঁর সচেতন প্রয়াস প্রাকরণিত বিন্যাসে পার্থক্য তুলে ধরে। নাগরিক জীবনের নারী-পুরুষের বিচিত্র রূপ এ গল্পে নতুন নন্দন ও নতুন ধারক হয়ে ওঠে অনায়াসেই। স্বাতী চরিত্রে গল্পকার নারীর বিচিত্র রূপের মধ্যে অনবদ্য কলা-কৌশলের রহস্যময় কৌতূহলী করে তোলে—

> *"কিছু মানুষ আছে যাদের অনুমোদন থাকলে নির্জলা মিথ্যাকেও সত্যি বলে ভাবা যায়। স্বাতী ওরকম, ওর কথায় একটা প্রত্যয়ী ভাব আছে।"*[২৩]

বাবু আর মিনির শিথিল দাম্পত্য জীবনের সুখের বার্তা বহন করে এনেছিল একটি চিঠি।

> *"সুখী মিনির চোখ থেকে দৃষ্টিটা এবার চিঠিতে সরিয়ে আনে বাবু। চিঠি কই চিরকুট একটা এক লাইনের, 'রবিবার সকালে প্লেনে আসছি রন্‌জন্‌'।"*[২৪]

'মিনির হাসি' গল্পে গল্পকার ব্যক্তি-জীবনের অনুষঙ্গে নানা অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। মিনির হাসি-দীপ্ত রহস্যময় প্রতীকীবিশ্বের পরিসরে পাঠককে পৌঁছে দেয় অন্য জগতে। সময় ও সামাজিক পরিসরে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও রহস্যময় আলো-আঁধারি জটিলতার আবর্তে গল্পের বয়ন খানিকটা দুর্বহ হয়ে ওঠে। কথকসত্তা মিনির হাসির নির্দিষ্ট অর্থের গন্ডি না বেধে রহস্যময় চেনা-অচেনা সুরে গেঁথে দিয়েছেন।

কথক আর মিনি সাগর দেখার নেশায় বেড়াতে যায়। প্রসঙ্গক্রমে ঘটনায় কথকের অহেতুক বার্তালাপে মিনির হাসি তাৎপর্যপূর্ণ। মিনির হাসিই যেন অব্যক্ত বিভিন্ন অর্থবহ কথা গল্পকার তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। লেখক মূল্যবোধের তাড়নায় মিনির হাসি কথকের বিভিন্ন বয়ানে হাসির রকমও বদলে গেছে। লেখক ও পাঠকের দুটি ভিন্ন অবস্থান তেকে উদ্ভাসিত ভিন্ন প্রকরণে গল্পের অনবদ্যতা স্বীকার করে নিতে হয়।

এ চিঠিতে গল্পকারে ব্যক্তিসত্তার ছায়া পড়ে গড়ে উঠেছে রন্‌জন্‌। মিথিলেশ ভট্টাচার্য কয়েকজনের চোখে কয়েকজন প্রবন্ধে রণবীরের গল্পভাবনা—

> *"প্রকৃতির মতো প্রচন্ড নিস্পৃহতার কিছুদিন পর পর নিজেকে আগপাশতলা বদলে নেয় রণবীর, অস্থির ইমেজ তার, জটিল জলস্রোতের মতো গদ্য-শরীর, চিন্তাভাবনা, কথাবার্তা;"*[২৫]

প্রকৃত লেখক সময় ও পরিসরে অভিজ্ঞতা ও অনুভবে বাস্তব ও কল্পনার সমীকরণে গল্পে প্রাণ সঞ্চার করে। সময় ও সামাজিক পরিসরে রণবীর পুরকায়স্থের ছোটগল্প বিষয়বস্তুতে প্রাকরণিক বিন্যাসে নতুনত্ব দাবি রাখে।

এই গল্পে রনজন্ খুশি, ভালোলাগা অসুখের বার্তা বহন করে বাবু ও মিনির ক্ষয়িষ্ণু সম্পর্কের জোয়ার বয়ে এনেছে। তাদের সম্পর্কের শিথিলতাকে ভঙ্গ করে আনন্দের জোয়ার এনে দিয়েছে সে। রন্‌জন্ সুখ আর সুন্দরের দেবদূত। বাবুর সংসারে 'কু'এর বেড়াজাল ভঙ্গ করে 'আজি মোর শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর'। তার আগমনের বার্তায় ধরা পড়ে বাবু আর মিনির সুন্দর ও আনন্দের দ্বিরালাপে সম্পর্কের আসল নির্যাস। যা শুকিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আনন্দের আগমনের বার্তায় মিনি যেন আগের মিনি হয়ে যায়। ঈর্ষা, সন্দেহ, অবিশ্বাস দূরে টেনে দিয়ে নতুন জীবনের সন্ধান পায়—

> *"এত সহজে স্বাতীর নাম এই প্রথম মুখে আনল মিনি। কোন সন্দেহ বা ঈর্ষার লেশমাত্র আভাসও নেই কণ্ঠস্বরে। বাবু এত হালকা বোধ করছিল। বাবু ভাবছিল, আরো যেন কি মিনিকে বলা হলো না। এক মজার প্রগলভতায় পেয়ে বসে ওকো আর একটা সত্যি কথা বলতে যায়, জানো মিনি, আজ যখন সকালে আমাকে সন্দেহ করেছিলে, তখন তোমাকে একটা ভিখিরীর মতো ভাবছিলাম।"*[২৬]

নিঃস্তব্ধ নিঃসার বাবু আর মিনি দীর্ঘদিন শুয়ে কাটিয়েছে। মিনি এখন সুন্দরতর হয়ে শুধু আবেগ প্রবল মনকে জাগিয়ে রাখতে চায়।

পুরোনো কথাকে নতুন মনের অবগাহনে নতুন সুরে বাজিয়ে গল্পকার উন্নত শিল্পরীতির পরিচয় দিয়েছেন এ গল্পে। গন্ডিবদ্ধতাকে ভেঙে বিশাল পৃথিবীর

প্রকৃত সুরে লেখকসত্তার অনুভবে সৃজনশীলতার পরিচয় 'রন্‌জন্‌ আসছে' গল্পে।

বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্পে 'দুন্দুবুড়িকথা' সাম্প্রতিক বাংলা গল্পে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এই গল্পে তপোধীর ভট্টাচার্য— **"Nothing is anything in itself 'every existence is an event', 'Every being is a co-being"** বাখতিনের সমর্থন লক্ষ করেছেন গল্পবীক্ষায়। তাঁর গল্প বীক্ষণ জুড়ে আছে অজস্র দ্বিবাচনিকতা ও সমান্তরালতার অনুভব। সময় ও সামাজিক পরিসরে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ সাক্ষ্য দেয় তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তুতে প্রাকরণিক বিন্যাসে আর গল্পের বয়ানে, ভাষায়। তাঁর গল্প আসলে কাহিনি নির্ভর, সেখানে উপকাহিনি এবং অপ্রয়োজনীয় ঘটনার অতিরিক্ত সমাবেশ মাঝে মাঝে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করে।

> *"রণবীরের গল্পে text আছে দারুণ কিন্তু পরিণতিতে জটিলতার আবর্তে সাধারণ পাঠক যেন ঘুরপাক খায়।"*[২৭]

'মোহন দাসের জন্মবৃত্তান্ত' এ অন্তর্বয়নে সমৃদ্ধ পাঠকৃতি হিসেবে এর জুড়ি ভার। তবে এ গল্পে উত্তরপূর্বের পরিসর বহির্ভূত, মহানাগরিক কলকাতার কথনবিশ্ব আধারিত।

গণেশ দে শতাধিক গল্প লিখেছেন। গল্পে নৈতিক শিল্পভাবনা এবং বৃহৎকৌশলের জন্য বহু পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবেও স্বীকৃতি আছে। রম্যরচনার চমক তাঁর গল্পের ভাষাকেও প্রভাবিত করেছে। তবে তার গল্পের বিষয় প্রেম-প্রকৃতি-সৌন্দর্য। রমা পুরকায়স্থের মতে, প্রচলিত ধাঁচে গল্প বলা, আঙ্গিক বিষয়ে সচেতনতা তাঁর গল্পে লক্ষ করা যায় না। তবুও পাঠক মনে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ১৯৬৩ সালে গদ্য আন্দোলনে গণেশ দে 'শনিবার বিকেল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশে

যোগদান করেছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় গল্পসাহিত্যে এটি প্রথম গল্প সংকলনের দাবিদার। আর এতে প্রকাশিত কয়েকটি গল্প আঙ্গিক ও বিষয় বিন্যাসে উল্লেখের দাবি রাখে।

স্পষ্টভাষায় সমাজের লুকিয়ে থাকা অবান্তর কুসংস্কারকে শক্ত লেখনীতে প্রকাশ করে গল্প সাহিত্যে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন বদরুজ্জামান।

বরাক উপত্যকার গল্পকারদের গল্পে বৃহত্তর পরিসর জুড়ে আছে এ অঞ্চলের বাঙালি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জীবন। মধ্যবিত্ত জীবন ও মূল্যবোধের তাৎপর্যে বদরুজ্জামান চৌধুরীর 'গভীর অসুখ' নানা উচ্চাবচতা নিয়ে তৈরি। গল্পে স্কুলশিক্ষক ও সাহিত্যিক হাসান রাজনৈতিক স্থবিরতা মেনে নিতে পারে না। যে কিনা একসময় রাজনৈতিক দলে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। সে আজ সংসার ও পারিপার্শ্বিকের সমস্যায় জর্জরিত ও বিকৃত মূল্যবোধহীন রাজনৈতিক ভাবধারা তাকে আর আকৃষ্ট করে না কারণ—

> *"তোদের লাইনের রাজনীতি আমি কোনোদিন করিনি।*
> *...অনেকদিন আমি সে'সবে নেই। আমার অনেক কাজ।*
> *পারিবারিক অশান্তি। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।*
> *লেখালেখিও ছেড়ে দিচ্ছি।"* [২৮]

সাহাবুদ্দিন ওরফে সেবু নামক রাজনৈতিক নেতার অরাজকতায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, সাধারণ মানুষের সামান্য সুখ-সুবিধার অর্থ আত্মসাৎ করে। গল্পকার সেবু নামক চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের সমাজে যে রাজনৈতিক রীতি-নীতিতে গভীর অসুখ তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

দেশ, সমাজের উদাসীনতার জন্য কিছু স্বার্থান্বেষী লোভী মানুষ আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে এক ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দেয় প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। যারা আর আলোর পথ দেখতে পায় না। এ ভারাক্রান্ত শোক নিয়ে লেখক যেন

তাঁর অন্তরাত্মার অনুতাপের আখ্যান বাস্তব অভিজ্ঞতায় পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দেয় এক অস্থির সময়ে বিচ্ছুরণ। গল্পে রাজনৈতিক আবহাওয়ার আবর্তে হৃদয়ে প্রবল আবেগে ভরে দেয় নৈতিকবোধ। যা হাসান সেবুর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারে গিয়ে তার বাবার ক্লাশমেট অভয় চক্রবর্তীর পরিবার ও মেয়ে অপরাজিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। হাসান ও তার স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের জন্য দু'দিনের উপোসী অভয় চক্রবর্তী সাহায্যের হাত বাড়াতেই সব আক্রোশ তার ওপর ঢেলে দেয়। কিন্তু বদন্যতা 'কু'-কে আড়াল করে শুধু ভালোদিকই তুলে ধরেছিল পরিবারের কাছে। ফলে সে অনুতপ্ত হয়ে নিজের কাজে নিজেই ছোট হয়ে পড়ে। অনুতপ্তের কোষানলে দগ্ধ হয়ে সৎ প্রকৃত মানুষটি হাহাকার করে ওঠে। গল্পকার গভীরতর তাৎপর্যে ব্যক্তি পরিসরের সামগ্রিক প্রকৃত চেতনার বার্তা তুলে ধরেছেন—

> *"জানো না মানুষ আসলে কখনো খারাপ না, সবাই ভালো। মানুষ খারাপ তখনই হয় যখন তার গভীর অসুখ করে।"*[২৯]

কষ্টিপাথরে ঘষে যেমন প্রকৃত সোনা বোঝা যায়, তেমনি অনুতপ্তের আগুনে জ্বলে পুড়ে প্রকৃত মূল্যবোধের সৎ মানুষটি পুনরায় জাগ্রত হয়— "টের পায়, আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে যাবার মতো, তার মাথাব্যথাটাও কমে যাচ্ছে।"

গল্পকার বঞ্চিত, পীড়িত অন্দরমহলে নারীর হাহাকার, আর্তনাদ গল্পের অভীষ্ট বিষয় করে নিয়েছে। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে নারীর স্বর তুলে ধরেছেন প্রতিবাদী আকল্প হিসেবে। সমাজের শোষক শ্রেণী দ্বারা ভোগ্যপণ্য করে রাখা এবং মুসলমান সমাজব্যবস্থায় নারীর ব্যথা ও বেদনার কাহিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। পঁচাশি-ছিয়াশির বেশি বয়সেও স্ত্রীর মৃত্যুর পর যুবতী মেয়েকে বিয়ে করে অসামাজিকতার পরিচয় বহন করে—

"যুবতী কমবয়সী মেয়ে, বুড়ো-কাষ্ঠার ঘরে বসে করবেটা কী, পাকা চুল বাছবে?"[৩০]

এ গল্পে নারী আর তার প্রাধান্য যে কতটুকু তা আবেগে জর্জরিত মর্মন্তুদ কাহিনি। যে নারী আমাদের দেশের, সমাজের ব্যক্তির সদা যত্ন ও শুশ্রূষা করে গেছে, যে কিনা অন্ন যোগান দিয়ে অভুক্ত সন্তানকে প্রতিপালিত করেছে কখনও সন্তান, কখনও স্বামী, কখনও পিতাকে। কিন্তু সমাজে তাকেই সবচেয়ে বেশি বিনা অপরাধে শোষিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচার হতে হয়েছে। পুরুষশাসিত অসামাজিকতার বাস্তব চিত্র গল্পকার তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে।

"...ফুপু মাছ কুটছেন। হাত ধোবেন। তারপর পান-সুপারি সব সাজিয়ে দেবতার সম্মুখে নৈবেদ্য তুলে ধরবেন। দেবতার হাত-পা নেই। পানটা সেজে খেতে পারেন না। অথচ স্ত্রী পেটাবার বেলা সেই দেবতারই হাত-পা সব ঠিকঠাক চলে। প্রথমে লাথি, ঘুষি, তারপর ভারী পানের থালা ছুঁড়ে মারা হয় তার কপালে।"[৩০]

তাঁর গল্পে ধর্মীয় গোঁড়ামি, গ্রামের অশিক্ষিত নারী-পুরুষের ব্যথা ও বেদনার কাহিনি বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত এক নতুন অভিজ্ঞতা। 'জাগরণ', 'ছোটলোক', 'জানোয়ার', 'ইদ্রিশ মিঞার আত্মদর্শন', 'সে আরেক হানিফা' গল্পগুলি তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

বরাক উপত্যকার গল্পভুবনের একটি বিশিষ্ট আসনের দাবী রাখে শেখর দাশ। তাঁর গল্পে ভাষা, আঙ্গিক, ভাব সব কিছুই যেন সার্থক শিল্পীর হাতের যাদুর স্পর্শের মতোই যেন আলাদা। আলাদা এই কারণে তাঁর বেড়ে উঠা শস্য শ্যামল নরম বাংলার মায়ের বুকে নয়। কিন্তু তার গল্পের ভাষা ভাব কোন অংশে শীতলতা দেখা যায়নি। আমরা তাঁর গল্পবীক্ষায় তাই প্রমাণ পাই। আর রমা

পুরকায়স্থের লেখনীতেও আমরা শেখর দাশের স্পষ্ট একটা ধারণা পাই—

> *"বরাক উপত্যকার বাংলা গল্পে 'শতক্রতু'র আবিষ্কার শেখর দাশ, সত্তর দশকের এক উজ্জীবন। তিনি যেন ভিন্ন পথের পথিক। ভাবে ভাষায় আঙ্গিকে সব কিছুতেই তাঁর গল্প নূতন। প্রচলিত নিয়মে তিনি এক ব্যতিক্রম। প্রথাসিদ্ধ নির্মিতির চেনা রীতি ভেঙে তছনছ করে, তিনি কাছাড়ে বাংলা গল্পের এক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।"*[৩২]

শেখর দাশের প্রথম প্রকাশ 'ক্রমশ তাপ' গল্পে পাঠকের চিন্তাবিশ্বে উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল। 'শ্বেতরক্তকণা', 'খেলার ঘর', 'হরিণ', 'তদন্ত' গল্প যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নূতনত্বের আনয়ণ তাঁর লেখার উদ্দেশ্য। গল্প শিল্পগত তাগিদে সাহিত্যের জগতে হয়ে উঠে নানা পরিবর্তনের ধারায়, ভাষা-ভাব নির্ভর। গল্পকার যেন ভাস্কর্য নিপুণ, নিজের কৃতিকুশলতাকে বারংবার ভেঙে চূর্ণ করে প্রসারিত করতে হয় নিজেকেই— অন্য কোন আবিষ্কারের অমোঘতায়।

আর এই অন্য কোনো আবিষ্কারের পথ চেয়েই শেখর দাশের গল্পের পরিকাঠামো যেন অন্য ধাঁচের। সময়ের বার্তা তুলে ধরার তীব্র উন্মাদনা তাঁর গল্প অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র্য। জীবন উঠে এসেছে এক বিশেষ মূল্যবোধের মাপকাঠি হিসেবে। গল্পকারের সত্তা যেন গল্পের ফুলঝরির এক বর্ণগন্ধময় ফুল। ভাষা সাবলীল, ছোট ছোট ঝরঝরে বাক্য প্রতীকী ধাঁচের। শব্দগুলো বিকশিত করে তোলে আপন স্বরূপ কিংবা আত্মশক্তিকে। 'কোষাগার' গল্প সংকলনটি গল্প জগতের গল্পভাষার প্রাণ পাচ্ছে তাঁর হাতে।

'কোষাগার' গল্প সংকলনের ভূমিকায় তাত্ত্বিক ড০ তপোধীর ভট্টাচার্য

লিখেছেন—

> *"চেতনার চেয়ে বড়ো অবচেতন, ভাষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পরাভাষার। মোটর মেকানিকের প্রান্তিক অস্তিত্বে পৃথিবী-সমাজ-সময় গল্পকারের কাছে বুঝি বা ঘষা কাঁচের দেওয়ালের ওপারে। বাস্তব আর অবাস্তব, জৈবিক আর যান্ত্রিক অনুপুঙ্খ তাই পরস্পর সম্পৃক্ত। মোহনপুরের অপরতা থেকে বরাক উপত্যকার কেন্দ্রীয় শহর শিলচর এবং পরিচিত সম্পর্কের বিন্যাসকে কীভাবে দেখেছিল শেখর, তারই অসামান্য পাঠকৃতি 'ফেরারি'।"*[৩৩]

প্রকৃত ভাষ্যকার ভার বহন করেই যেন গল্পবিশ্বে অভিজ্ঞতা ও অনুভবের প্রকাশ মাধ্যম তাঁর জীবন সাহিত্যে। তাঁর গল্পভাষা কিছু বাক্যে কবিতার পঙ্‌ক্তির মতোই আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে—

> *"এই শহরটা শহর নয়, ছাউনি। অস্থায়ী। একদিন সবকিছু গুটিয়ে ফেলবে ওরা, চলে যাবে অন্য কোথাও। শহর তখন হয়ে পড়বে তেপান্তরের মাঠ। মানুষ নিজের খেয়ালে বসত গড়ে ভেঙেও ফেলে, যেভাবে নিয়তির খেয়ালে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যত বিশ্বাস— স্বপ্ন-সম্পর্ক। জীবনের কোন স্থিরতা নেই।"*[৩৪]

জীবনের বাস্তব আর পরিস্থিতির সামনে তাঁর ভাষা যে অন্যমাত্রা যোগ করে আমাদের ভাবনাকে নাড়িয়ে অনুভবের সৃষ্টি করে—

"বস্তিটা যেন নিষিদ্ধ এলাকা। শুধু একটি কাঁচা প্রাণ অপ্রাণ চেষ্টা করছে বস্তিতে ঢুকতো" [৩৫]

ভাষা কারুকার্যে কাব্যময় ভাব-ভঙ্গি আমাদের কাব্যজগতের স্বাদও আস্বাদন করিয়ে দেয়—

"বাইরে আকাশে একটা ঝকঝকে রূপোলি ইলিশ চিৎ, আঁশের মতো ছিন্নভিন্ন মেঘ, এ মেঘে বৃষ্টি হয় না।" [৩৬]

"আকাশে মেঘ নয়— উন্মাদের মলিন বস্ত্রের মতো শতছিন্ন কাপড়।" [৩৭]

বা

"একজন বিখ্যাত বয়স্কা মহিলার বিপন্ন হাসি, কালো দেয়াল জুড়ো একটু দূরেই গলিপথ, বিক্ষিপ্ত দেয়াল লিখন। ... চৌকো ছবি, ঝাপসা, বিপন্ন হাসি। শব্দহীন।" [৩৮]

"এতটা বুঝতে পারলে তো আর মানুষের ভালোবাসা মানুষকেই ডিঙিয়ে যেতা" [৩৯]

"মেঘের আড়ালে ফ্ল্যাশ ক্যামেরার আর্তনাদ, শব্দহীন। মাটি আর আকাশে তখন কোন ভেদ নেই। জল, শুধু বৃষ্টি। ... ঠিকই ভালবাসায় বড় বেশি কারুকাজ।" [৪০]

দাঙ্গায় মানুষের অসহায় ও দুর্বলতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী দুষ্টু শাসকগোষ্ঠী

অপকর্ম চালিয়ে যায় বিষাক্ত আবহাওয়ায়। একই স্বজাতি মানুষের হাতে প্রাণ দিতে হয় রইস আলিকে৷ দাঙ্গার চেয়েও বেশি উত্তেজক মুখরোচক বিষাক্ত গুজব। আর তা সামাজিক দায়বদ্ধতায় লেখকসত্তা বলিষ্ঠ দক্ষতায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সত্যভ্রম থেকে সত্যকে আলাদা করে দেওয়ার সামাজিক দায় সংবেদনশীল লেখককেই বইতে হয়।

'আজান' গল্পের ভাষা, ভাব মনে করিয়ে যে শেখর দাশ ভিন্ন পথের পথিক—

"বড় ভুল সময় বাছলে জোয়াদ ভাই।"[৪১]

স্থান ও সময়ের দ্বিবাচনিকতায় ছোটগল্পের পরিসরকে রূপ থেকে রূপান্তরে, কথনবিশ্বকে স্বর থেকে স্বরান্তরে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত৷ মানুষের জীবনযাত্রায় আজকাল তে বেশি সমস্যা ও যন্ত্রণার আর্তি, অধিক বিচিত্র সমতার পরিসর। ফলে বাস্তববোধ মানুষকে নদীর মতো শুধু এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়। শত বাধা, শত কষ্ট, শত যন্ত্রণা অতিক্রম করে মানু, এগিয়ে যায় বিকল্প অধরা বাস্তববোধে। যা বর্তমান মুহ্যমান দুঃখের পাহাড়কে অতিক্রম করার ইন্ধন জুগিয়ে যায় নতুন স্বপ্নের সূর্য উদয়ের আশায়।

সময়ের অস্থিরতার গণ্ডি ভেঙে আশাবাদী ও স্বপ্নের নরম আলোর নতুন সকালের স্বপ্ন গল্পকারের দু-চোখ জুড়ে রয়েছে—

"কোন সঙ্কটই বেশি দিন স্থায়ী হয় না। অন্তত
তীব্রতা। কোনো কুয়াশাও বেশিদিন থাকে না।
একদিন শীত গেল। কুয়াশা কাটল।"[৪২]

শেখর দাশ তাঁর গল্পে জীবন সম্পর্কে বিশ্লেষণী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের প্রতিবেদন আমাদের দেখতে শেখায়, বুঝিয়ে দেয়, যা আপাতত ঘটেছে

তার পিছনে লুকিয়ে আছে অন্য কথাবস্তু বা সারসত্য। যা খালি চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না, দ্রষ্টার চক্ষুর প্রয়োজন হয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অচলায়তনে পথভ্রষ্ট হয়ে তাদের মতাদর্শ খাঁচাবন্দি প্রাণ ছটফট করে উঠে আকুল আর্তনাদে বিকল্প মুক্তির আশায়।

গল্পে শুধু ভাষা নয়, সময়ের নিদারুণ ছাপও শুনিয়ে জ্ঞাত করে দেয় গল্পকার— বর্তমান অস্থির মূল্যবোধকে—

"পৃথিবী এত নিষ্ঠুর বিবেকহীন— মলি অস্থির হয়।
সীসার তপ্ত পিণ্ড ধমনীতে গড়ায়।"[৪৩]

শেখর দাশ জানেন, জীবন নামক ভাঙাগড়া খেলায় অনেক যত্নের মূল্যবান রতনও হারিয়ে যায় নদীর স্রোতে— যা আর ফিরে আসে না কোনোদিনও; শুধু থেকে যায় স্মৃতি হয়ে। কিন্তু মানুষ যান্ত্রিক সভ্যতায় দাঁড়িয়ে আত্মকেন্দ্রিক মনুষ্যত্ব নিয়ে শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। পারিপার্শ্বিকের সুখ-দুঃখ কোনো ছায়াপাত করে না একে-অন্যকে। এই অস্থির সময়ে সমাজের গভীরতর অসুখে লেখকসত্তা ক্ষত-বিক্ষত।

জীবনের গল্পে, বিষাদসিন্ধুর পরেও মানুষ স্বপ্ন দেখে চেতন-অবচেতনে আকাঙিক্ষত পৃথিবীর, যা বর্তমান সমাজের প্রতিফলিত রূপ চিত্রিত করে—

"শোক আর সংক্রামিত করে না কোন কিছু, প্রমাণিত
হয়।"[৪৪]

ভাষা, ভাব, চরিত্র সৃষ্টিতে শেখর দাশের হাতে যেন যাদুর স্পর্শে সবকিছু জীবন্ত। পৃথক রঙে ছবি এঁকেছেন গল্প সাহিত্য জগতে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে চরিত্রের দ্বিরালাপ বাচনে, অঙ্গনে কৃৎকৌশলে ছাপ রেখেছেন গল্পসমূহে। সুতরাং শেখর দাশ ভাষা, ভাব, আবেগে গল্পবিশ্বে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র :

১. 'অনিশ' সম্পাদকীয়, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী

২. বাংলা গল্পে কাছাড়, তপোধীর ভট্টাচার্য : ঝঙ্কার ১৯৭৩-৭৪

৩. গল্পবিষয়ক ক্রোড়পত্র, সাহিত্য ষোড়শ সংকলন, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ বাংলা

৪. বরাক উপত্যকায় বাংলা কথাসাহিত্য— বিশ্বতোষ চৌধুরী, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন দ্বিষষ্টিতম অধিবেশন, ১৩৯৬, পৃঃ ৩১

৫. ছোটগল্প : উন্মোচন পর্ব, রমা পুরকায়স্থ, বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা, নভেম্বর ২০০৫, পৃঃ ১২৪

৬. বরাক উপত্যকায় ছোটগল্পের ভগীরথ : কথকতার অন্তঃপুর, তপোধীর ভট্টাচার্য, যে-গল্পের শেষ নেই, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, মে ২০১০, পৃঃ ১৬

৭. তদেব, পৃঃ ১৭

৮. একটি লিটল ম্যাগের জন্য আংটি, ঘড়ি, ট্র্যাঞ্জিস্টার বিক্রি করবে কে?, বিজয় কুমার ভট্টাচার্য, অনিশ- শতক্রতু বিশেষ সংখ্যা তপোধীর ভট্টাচার্য, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, রণবীর পুরকায়স্থ, জুন ২০১৪, পৃঃ

৯. আশ্রয়, শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য, বরাক কুশিয়ারার গল্প, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃঃ ২৮

১০. গল্প লেখার গল্প, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, অনিশ- শতক্রতু বিশেষ সংখ্যা, তপোধীর ভট্টাচার্য, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, রণবীর পুরকায়স্থ, ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃঃ ৮৮

১১. আশ্রয়, শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য, বরাক কুশিয়ারার গল্প, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃঃ ২৯

১২. তদেব, পৃঃ ৩১

১৩. তদেব, পৃঃ ৩১

১৪. মানুষ মানুষের জন্য, শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য, বরাক কুশিয়ারার গল্প, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃঃ ১৯

১৫. তদেব, পৃঃ ২১

১৬. ছারপোকা, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, শতক্রতু, প্রস্তাবনা সংখ্যা, তপোধীর ভট্টাচার্য, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, আষাঢ় ১৩৮০ বাংলা, পৃঃ ২

১৭. পূর্বদেশ ১৯৯০ সংখ্যায় শিব ভট্টাচার্যের আলোচনা থেকে, পৃঃ ১৭

১৮. চৈত্র পবনে, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, ২০১১, পৃঃ ২৯

১৯. গ্রীষ্মের দুপুরে, চৈত্রপবনে মিথিলেশ ভট্টাচার্য, ২০১১, পৃঃ ৪৫

২০. সামসুলের সীমানা, অরিজিৎ চৌধুরী, বরাক কুশিয়ারার গল্প, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃঃ ৭৪

২১. নিরালম্ব, অরিজিৎ চৌধুরী, বরাক কুশিয়ারার গল্প, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃঃ ৮২

২২. তদেব, পৃঃ ৭৮

২৩. রনজন আসছে, রনবীর পুরকায়স্থ, শতক্রতু ২০, আষাঢ়, ১৩৮৫, ৫ম বর্ষ, ২-৬ সংখ্যা, পৃঃ ১

২৪. তদেব, পৃঃ ৪

২৫. শতক্রতু, তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮২, পৃঃ ৮

২৬. রনজন আসছে, রণবীর পুরকায়স্থ, শতক্রতু ২০, আষাঢ়, ১৩৮৫, ৫ম বর্ষ ২-৬ সংখ্যা, পৃঃ ১০

২৭. বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা, রমা পুরকায়স্থ, ২০০৫, পৃঃ ১২৬

২৮. গভীর অসুখ, বদরুজ্জামান চৌধুরী, বরাক কুশিয়ারার গল্প, মিথিলেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃঃ ৪১

২৯. তদেব, পৃঃ ৫১

৩০. অন্নদাত্রী, বদরুজ্জামান চৌধুরী, বরাক কুশিয়ারার গল্প, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃঃ ৩৬

৩১. তদেব, পৃঃ ৩৮

৩২. বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা, রমা পুরকায়স্থ, ২০০৫, পৃঃ ১২৬

৩৩. ভূমিকা, ড০ তপোধীর ভট্টাচার্য, কোষাগার, শেখর দাশ, ২০০০

৩৪. ফেরারি, কোষাগার, শেখর দাশ, ২০০০, পৃঃ ৫৪

৩৫. জোড়শালিখ, কোষাগার, শেখর দাশ, ২০০০, পৃঃ ১১

৩৬. ডায়নোসোরের ফুসফুস, শেখর দাশ, কোষাগার, ২০০০, পৃঃ ১৪

৩৭. দ্রাঘিমা, শেখর দাশ, অমৃতলোক ৪৭, ২য়-৩য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃঃ ৩০২

৩৮. ডায়নোসোরের ফুসফুস, কোষাগার, শেখর দাশ, ২০০০, পৃঃ ১৪

৩৯. তদেব, পৃঃ ১৮

৪০. শব্দের প্রতিচ্ছবি, কোষাগার, শেখর দাশ, ২০০০, পৃঃ ৩০

৪১. 'আজান', কোষাগার, শেখর দাশ, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০০ইং, পৃঃ ৩৭

৪২. অপ্সরা, কোষাগার, শেখর দাশ, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০০ইং, পৃঃ ৮৫

৪৩. তদেব, পৃঃ

৪৪. কোষাগার, কোষাগার, শেখর দাশ, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০০ইং, পৃঃ ৮৯